আমাদের আধুনিকতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

[গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা-র সভাকক্ষে 'শ্রীজ্ঞান হালদার স্মারক বক্তৃতা' হিসাবে লেখক রচনাটি পাঠ করেন। এখানে তা মুদ্রিত হল। —সম্পাদক।]

আজকের সভায় যে আমার বক্তৃতা করতে হচ্ছে, এই ঘটনার মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছি। প্রথমত, যে-শ্রেণীর বক্তাদের সচরাচর এই ধরনের আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা করতে ডাকা হয়, প্রাজ্ঞতা, প্রাচীনতা এবং মুরুব্বিয়ানায় আমি যে নিজের অজান্তেই সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি, এটা আবিষ্কার করে খুবই চমকে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমার ছাত্র এবং অনুজপ্রতিম শ্রীজ্ঞান হালদারের স্মরণে আমি বক্তৃতা করছি, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কিছুই হতে পারে না। বরং আমার স্মরণে শ্রীজ্ঞান বক্তৃতা করছে, এমন হলেই তা প্রাকৃতিক নিয়ম আর সামাজিক প্রথা, দুই-এর সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ হত। তৃতীয়ত, বাল্যকাল থেকে দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু নাটকীয় জীবন, আর ততোধিক নাটকীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দেশ-কাল-

সমাজ সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল, নিজের বিচারবুদ্ধি আর বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠা এবং জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসার যে সাক্ষ্য সে রেখে গেছে, তার প্রতি সুবিচার করার মতো ভাষা অথবা চিন্তা আমার নেই— এ-কথাটা তেমন অদ্ভুত হয়ত না-ও হতে পারে, কিন্তু শ্রীজ্ঞানের স্মৃতির কাছে আমার এই দৈন্য স্বীকার না করে আমি আমার বক্তৃতা শুরু করতে পারছি না।

এক

আমার আলোচ্য বিষয় 'আধুনিকতা', কিন্তু বিশেষ করে 'আমাদের আধুনিকতা'। এই তফাৎটা করার ভেতর দিয়ে নিশ্চয় এটাই বোঝাতে চাইছি যে সবরকমের আধুনিকতা আমাদের নয়, কিংবা আমাদের আধুনিকতার মধ্যে কিছু একটা বিশেষত্ব আছে। হয়ত এমনও হতে পারে, অন্যেরা যা আধুনিক বলে মনে করে, আমরা তা গ্রহণ করিনি, আবার আমরা যাকে আধুনিকতার অঙ্গ বলে সযত্নে লালন করেছি, অন্যেরা তাকে আধুনিক বলেই গ্রাহ্য করে না। এই ভিন্নতার জন্য আমরা গর্বিত হব, না হীনমন্যতায় ভুগব, সে-প্রশ্ন পরে তুলব। আপাতত দেখা যাক, আধুনিকতা বলতে আমরা কী বুঝেছি।

১৮৭৩ সালে রাজনারায়ণ বসু 'সে কাল আর এ কাল'-এর মধ্যে একটা তুলনামূলক বিচার করার চেষ্টা করেছিলেন। 'সে কাল' আর 'এ কাল' বলতে ইংরেজি শিক্ষা রীতিমতো প্রচলন হওয়ার আগের আর পরের সময়। এখন আমরা যে-অর্থে 'আধুনিক' শব্দটা ব্যবহার করি, উনিশ শতকে তা প্রচলিত ছিল না। তখন বলা হত 'নব্য', এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা আর ভাবধারার সঙ্গেই তাকে একান্তভাবে যুক্ত করে দেখা হত। সেই-সঙ্গে, আরো একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল— 'উন্নতি'— 'উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় সমাজদর্শনের ভাষায় 'ইমপ্রুভমেন্ট' বা 'প্রোগ্রেস', এখন আমরা যাকে সাধারণত বলি 'প্রগতি'। রাজনারায়ণবাবু বলা বাহুল্য, নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত, সংস্কারপন্থী, আধুনিক ভাবধারার পক্ষপাতী। সেকাল আর একালের তুলনা করতে গিয়ে তিনি সাতটি বিষয়ে উন্নতি অথবা অবনতির আলোচনা করেছিলেন। সাতটি বিষয় হল— শরীর, বিদ্যাশিক্ষা, উপজীবিকা, সমাজ, চরিত্র, রাজ্য, ধর্ম। সবকটি বিষয়ের আলোচনাতেই কিছু কিছু সুপরিচিত প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। যেমন, সেকালে লোকে ধর্মভীরু, সরল, স্নেহশীল, দয়াশীল ছিল। একালে ধর্ম বলতে আমোদ-উৎসব, আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের দিকেই লোকের ঝোঁক বেশি। খলতা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। 'এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া শীঘ্র বুঝিবার যো নাই যে, তাহার মনের ভাব কি ?··· পূর্বে বাটীতে লোক আইলে তিনি যাহাতে অধিক দিন থাকেন, লোকে এমন আগ্রহ প্রকাশ করিত, পূর্বে ঘটি বাঁধা দিয়া লোকে অতিথিসেবার ব্যয় নির্বাহ করিত, এক্ষণে অতিথি বাটী হইতে বেরুতে পারিলে বাঁচে।' সামাজিকতার রীতিনীতি পরিবর্তনের এ-জাতীয় আরো অনেক উদাহরণ দিয়েছেন।

কিন্তু সেকাল আর একালের তুলনায় রাজনারায়ণ সবচেয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে-বিষয়টি নিয়ে, সেটি হল শরীর। প্রসঙ্গটি একটু বিশদভাবে এখানে উপস্থিত করতে চাই, কারণ এর মধ্যে আমাদের আধুনিকতার একটা কৌতূহলজনক দিক লুকিয়ে আছে।

'প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলবেন, আমার পিতা ও পিতামহ বড় বলবান ছিলেন। সেকালের লোকের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান লোকদিগের কিছুই বল নাই বলিলে হয়।··· এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক জীবিত ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন তাহা হইলে আমাদিগকে খর্ব্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন, সন্দেহ নাই। ছেলেবেলা সে কালের স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প সকল শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, পুরুষের এরূপ সাহসের কার্য্য শুনা যায়না।

'এক্ষণকার পুরুষেরা একটা শিয়াল তাড়াইতেও সক্ষম নহে।'

মোটের ওপর একালের লোক— রাজনারায়ণ এখানে যোগ করছেন, 'বিশেষত ভদ্রলোক' —ক্ষীণ, রুগ্ন এবং অল্পায়ু হয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্ত ভেবে দেখা যাক, কথাটার মানে কী। 'এ কাল' বলতে যদি বুঝতে হয় আধুনিক যুগ, ইংরেজ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা নব্যসভ্যতার যুগ, তাহলে সেই আধুনিকতার ফল মানুষের স্বাস্থ্যহানি? সামাজিকতা, নীতিবোধ, ধর্মভাব ইত্যাদি নিয়ে না-হয় তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু নিতান্ত জাগতিক বিষয়গুলোর মধ্যেও যা সবচেয়ে মৌলিক, সেই জৈবিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সেকালের তুলনায় একালের মানুষ দুর্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়ে পড়েছে, একথা আদৌ কারো মনে হতে পারে?

আমার ঐতিহাসিক বন্ধুরা সতর্ক থাকলে অবশ্য এক্ষুনি আপত্তি তুলবেন: কিন্তু এ তো ১৮৭৩-এর কথা! আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা তো তখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে ইয়োরোপীয় সম্প্রদায় আর সেনাবাহিনীর সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনসমষ্টির দিকে এগোতেই শুরু করেনি। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য অগ্রগতি, ১৮৭৩-এ রাজনারায়ণ তা দেখবেন কী করে?

এই যদি আপত্তি হয়, তাহলে আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯১২ সালে অল-ইন্ডিয়া স্যানিটারি কনফারেন্সে বক্তৃতা করতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষ বলছেন, ষাট বছর আগে তাঁর ছেলেবেলায় অর্থাৎ মোটামুটি রাজনারায়ণ বসু-র 'এ কালে', যশোর জেলার গ্রামাঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ছিল। সামান্য জ্বরজারি হত। কিন্তু উপযুক্ত পথ্য দিলেই তা দু-চার দিনের মধ্যে সেরে যেত। টাইফয়েড খুব সামান্যই হত, কলেরার নামও কেউ শোনেনি। বসন্তরোগ হত, কিন্তু টীকাদাররা তাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে রুগিদের অনায়াসেই সারিয়ে তুলত। পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব ছিল না। লোকের শরীর-মন স্বাস্থ্য, উৎসাহ আর আনন্দে ভরপুর ছিল। সারাদিন তারা নানা ধরনের স্বাস্থ্যকর খেলাধুলায় ব্যাপৃত

থাকত। আরো সাম্প্রতিক উদাহরণ দিতে পারি। এই সেদিনের কথা, ১৯৮২ সালে মণিকুন্তলা সেন তাঁর বরিশালের ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে লিখছেন, 'এখন কান্না পায়! হায় আল্লা, এমন যজ্ঞসভ্যতা তুমি আমাদের কেন দিলে? বেশ তো ছিলাম ভাতে-ডালে মাছে-দুধে। এখন শুনছি সেই বরিশালের ইলিশ নেই।' আর একেবারে হালের লেখিকা কল্যাণী দত্ত ১৯৯৩-এ প্রকাশিত 'থোড় বড়ি খাড়া' বই-এ তাঁর ছোটবেলায় দেখা অন্দরমহলের কথা বলতে গিয়ে এতরকমের খাওয়ার গল্প বলেছেন যে রাজনারায়ণ বসু-র 'সে কালের' লোকেরা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের উত্তর কলকাতায় বেশ বহাল তবিয়তেই বিরাজমান ছিলেন বলে মনে হয়। 'ভরপেট খাওয়ার পরও', কল্যাণী দত্ত বলছেন, 'তিরিশ-চল্লিশটা আম হামেশাই লোকে খেত।'

দৃষ্টান্ত অনেক বাড়ানো যায়; যে দু-চারটে হাতের কাছে পেলাম, তাই দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রাজনারায়ণের কথাগুলো প্রয়োজনীয় ঝাড়পোঁছ করে যদি আমি এখনকার কোনো লেখকের মন্তব্য বলে চালিয়ে দিতাম, আপনারা কেউ-ই আশ্চর্য হতেন না, কারণ এ-রকম কথা আমরা এখনো আকছার বলে এবং শুনে থাকি।

প্রশ্ন হল, সম্পূর্ণ তথ্যবিরোধী এরকম একটা ধারণা আমরা এত অনায়াসে গত একশো বছর ধরে পোষণ করে এসেছি কেন? না কি আসলে আমরা আমাদের আধুনিকতার এমন কোনো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছি যা ঐ সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে ধরা পড়ছে না? তাহলে আসুন, দেখা যাক সেকালের তুলনায় একালে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ খুঁজতে গিয়ে রাজনারায়ণ কী দেখতে পাচ্ছেন।

প্রথম কারণ, রাজনারায়ণ বলছেন, নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্তন। 'পূর্ব্বে লোকে কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী, শান্তিপুর প্রভৃতি গ্রামে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যাইত কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল স্থান মেলেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বাষ্পনিবন্ধন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ['দূষিত বাষ্প' বলতে miasma—সেসময় ম্যালেরিয়ার কারণ বোঝাতে ঐটেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল।] ...নানা কারণে বোধ হইতেছে যে, ভারতবর্ষে একটি মহা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এরূপ পরিবর্ত্তন লোকের শারীরিক বলবীর্য্যের প্রতি স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয় কারণ, খাদ্য— পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, কৃত্রিম এবং অনিষ্টকর খাদ্যের ব্যবহার, মদ্যপানের প্রবলতা। 'পূর্ব্বকার লোকেরা বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। এক্ষণকার লোকে সেরূপ পারে না।' তৃতীয় কারণ, অতিশয় পরিশ্রম, অসময়ে পরিশ্রম এবং ব্যায়ামচর্চার হ্রাস।

'এতদ্দেশে ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিশ্রম, অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরেজেরা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন, আমরা সেরূপ কখনই পারি না। কিন্তু ইংরাজেরা চাহেন যে, আমরা তাঁহাদের ন্যায় পরিশ্রম করি। ইংরাজী পরিশ্রম এ দেশের উপযুক্ত নহে।... এখনকার রাজপুরুষেরা

যে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার নিয়ম করিয়াছেন, ইহা এ দেশের পক্ষে কোনরূপে উপযোগী নহে।'

চতুর্থ কারণ, জীবনযাত্রার রীতি। সেকালের লোকের অভাব অল্প ছিল, তাই তাঁরা আনন্দে থাকতেন। এখনকার জীবনযাত্রায় দুর্ভাবনার শেষ নেই। 'এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সংগে সংগে ইউরোপীয় অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না' রাজনারায়ণ এখানে দুই বৃদ্ধের তুলনা করেছেন, একজন দেশি বা ভার্নাকুলার বৃদ্ধ, অন্যজন ইংরেজি-নবিশ বা অ্যাংলিসাইজড বৃদ্ধ।

'এংগ্লিসাইজ্ড বুড়ো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ণ্যাকিউলর বুড়োর রাত্রি থাকিতে, নিদ্রাভংগ হয়। নিদ্রা ভংগ হইলে বিছানাতে শুইয়া শুইয়া ধর্ম্ম-সংগীত গান করেন— ইহা কেমন চিত্তপ্রফুল্লকর! তৎপরে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করেন,— ইহাতে শরীর কেমন ভাল থাকে। তারপর স্নান করিয়া ফুলের বাগানে গিয়া ফুল তুলে আনেন— পুষ্পের সুগন্ধ শরীরের পক্ষে কেমন হিতকর। ফুল আহরণ করিয়া দেবপূজা করেন, —তাহা মনের প্রফুল্লতা সঞ্চার করিয়া শরীর মন উভয়ের বল সাধন করে। ...আর যিনি এংগ্লিসাইজ্ড বুড়ো, তিনি খানা খাইয়া ও ব্রান্ডি পান করিয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান ; সূর্য্যোদয় কেমন করে হয়, তা কখন দেখেন নাই ও প্রাতঃকালে সুস্নিগ্ধ বায়ু কখন সেবন করেন নাই। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো, কিন্তু এমন সহজ কাজ যে, চক্ষু সম্পূর্ণরূপে খোলা, ইহাও তাঁহার পক্ষে দুষ্কর কার্য্য বোধ হয়। শারীরিক গ্লানি অত্যন্ত, খোঁমারি হইয়াছে, বিপদ উপস্থিত !! এইরূপে ইংরাজী আহার পানে ও অন্যান্য ইংরাজী রীতি পালনে এংগ্লিসাইজ্ড বুড়োর শরীর নানা রোগের আধার হয়।'

রাজনারায়ণ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর এই দৃষ্টান্তে অতিশয়োক্তি আছে। কিন্তু পূর্বের তুলনায় বর্তমান যুগে স্বাস্থ্যের অবনতির যতগুলো কারণ তিনি দেখাচ্ছেন সবগুলোর ভেতরেই একটা অভিযোগ খুব স্পষ্ট। আধুনিক হওয়ার যে নির্দিষ্ট উপায়গুলো আমরা অবলম্বন করছি, তার প্রত্যেকটা আমাদের উপযুক্ত নয়। অথচ ইংরেজি আধুনিকতার নির্বিচার অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা ডেকে আনছি প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি, খাদ্যাভাব, অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত স্বাস্থ্যহানি এবং এক অবিন্যস্ত, অসংযত জীবনযাত্রা। নির্বিচার ইংরেজ অনুকরণের অনেক দৃষ্টান্ত রাজনারায়ণ দিয়েছেন। যেমন, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব প্রসংগে এই গল্পটি।

"এক বার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Veal হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'নহি হ্যায় খোদাওন্দ'। বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিলেন, Beefsteak হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Ox tongue হ্যায় ? খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Calf's foot jelly হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু বলিলেন, 'গোরুকা কুচ্ হ্যায় নহি ?' এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত গোমাংসপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ওরে! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না ?"

যে-বস্তব্যের সূত্র ধরে এই গল্পটি, সেটি হল যে 'এ দেশের লোকের পক্ষে গোমাংস অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য।' অথচ যেটি অনেক বেশি উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর, সেই দুধ আর পাওয়া যায় না। ইংরাজ রাজপুরুষ, মুসলমান আর কয়েকজন গোখাদক বাঙালি 'গোরু খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলিলেন, এই জন্য দুগ্ধ মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে।' রাজনারায়ণের দেওয়া অনেকগুলো দৃষ্টান্ত এবং কারণই এখন আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু তাঁর মূল প্রচেষ্টাটির মধ্যে হাস্যকর কিছু নেই। সেটি হল, এমন একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা যে দেশ-কাল-পরিবেশ-সমাজ নির্বিশেষে কোনো এক রকমের আধুনিকতা হতে পারে না। পরিবেশ অনুযায়ী, সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন দেশে আধুনিকতার রূপও ভিন্ন হতে হবে। এমনকি রাজনারায়ণের কথাগুলো আর একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে এমনও বলা যেতে পারে যে বিশেষ অবস্থা অনুসারে আধুনিকতার এই বিশিষ্ট রূপগুলি নির্ধারণ করতে পারা, যুক্তি-তর্ক-বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে আধুনিকতার কোন্ কোন্ প্রকরণগুলি আমাদের উপযুক্ত, তা নির্বাচন অথবা উদ্ভাবন করতে পারা, সেটাই যথার্থ আধুনিকতা। অর্থাৎ আধুনিকতার কোনো সর্বগ্রাহ্য বা সামান্য সংজ্ঞা যদি কিছু থাকে, তা হল এই যে যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সামান্য আধুনিকতা আমাদের নিজস্ব এবং বিশেষ আধুনিকতার স্বরূপটিকে চিনে নিতে সক্ষম করে।

দুই

নিজের বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজস্ব কর্মপন্থা স্থির করা যায় কীভাবে ? আসুন, পাশ্চাত্য আধুনিকতার নিজের জবানিতেই এই প্রশ্নের উত্তরটা শোনা যাক। ১৭৮৪ সালে ইমানুয়েল কান্ট একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের বিষয় 'আউফক্লারুং', ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি 'এনলাইটেনমেন্ট', অর্থাৎ 'আলোকপ্রাপ্তি'। কান্ট-এর মতে 'আলোকপ্রাপ্তি' মানে মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা, অপরের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হওয়া। যে-অবস্থায় মানুষ আলোকপ্রাপ্ত নয়, সে-অবস্থায় তার নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে সে অপরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয়, অপরের নির্দেশে চলে। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে নিজস্ব জ্ঞান আহরণের কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করে না, কারণ ধর্মগ্রন্থে সবই লেখা আছে। নিজে থেকে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার

সে চেষ্টাও করে না। ধর্মযাজক যা উপদেশ দেন তাই সে মেনে চলে। এমন কি, সে কী খাবে না-খাবে, তার বিচারও সে চিকিৎসকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে অধিকাংশ মানুষই এই অর্থে অপ্রাপ্তবয়স্ক। আর সমাজের যারা অভিভাবক, তারাও এটাই চেয়েছে যে বাকি সকলে তাদের তাঁবে থাকুক, স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা না করুক। বর্তমান যুগেই প্রথম আলোকপ্রাপ্তির যুগ, যখন স্বনির্ভরতার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। আর এতদিনের এই স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া পরমুখাপেক্ষার অবসানের প্রাথমিক শর্ত যে স্বাধীনতা, বিশেষ করে নাগরিক স্বাধীনতা, তাও এই বর্তমান যুগেই প্রথম স্বীকৃত। তার মানে এই নয় যে বর্তমান জগতে সকলেই আলোকপ্রাপ্ত, এমন নয় যে আমরা এক আলোকপ্রাপ্ত যুগে বাস করছি। বরং বলা উচিত, আমাদের যুগ আলোকপ্রাপ্তির যুগ।

কান্টের এই প্রবন্ধটি নিয়ে সম্প্রতিকালে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো। 'এনলাইটেনমেন্ট'-কে কান্ট যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? ফুকো বলেছেন, নতুনত্ব এইখানে যে এই প্রথম একজন দার্শনিক তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধানকে নিজের যুগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন এবং এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সমসাময়িক অবস্থা অনুকূল ছিল বলেই তাঁর সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব হল। অর্থাৎ এই প্রথম একজন দার্শনিক বর্তমান যুগের স্বরূপকে দার্শনিক অনুসন্ধানের বিষয় করলেন, সমসাময়িক পরিবেশের ভেতরে থেকেই জ্ঞানচর্চার অনুকূল সামাজিক শর্তগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলেন।

বর্তমানের স্বরূপ বোঝাতে যে-লক্ষণগুলি কান্ট দেখালেন, সেগুলি কেমন? ফুকো বলছেন, এখানেই নতুন চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। বর্তমান যুগকে চিহ্নিত করতে গিয়ে কান্ট কোনো যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘটনার কথা বলছেন না— বলছেন না অমুক ঘটনায় পূর্বতন যুগের অবসান ঘটল। বর্তমান বা আলোকপ্রাপ্তির যুগ শুরু হল। এমনও নয় যে বর্তমান যুগের বিশেষ চিহ্নগুলির মধ্যে কান্ট ভবিষ্যৎ কোনো বৈপ্লবিক ঘটনার পূর্বলক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। এমনকি অতীত থেকে কোনো এক অনাগত ভবিষ্যৎ যুগের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বিশেষ একটি পর্ব বা ঐতিহাসিক বিকাশের একটি স্তর হিসেবেও বর্তমানকে দেখছেন না কান্ট। ঐতিহাসিক যুগ হিসেবে বর্তমানকে বর্ণনা করার এই সবগুলি পদ্ধতিই ইয়োরোপীয় চিন্তায় কান্টের বহু আগে গ্রিক যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল, কান্টের পরেও তার প্রচলন কমেনি। কিন্তু ফুকোর মতে কান্টের বর্তমান যুগের লক্ষণ নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য হল যে লক্ষণগুলি একান্তভাবেই নেতিবাচক, নঞর্থক। আলোকপ্রাপ্তি মানে নিষ্ক্রমণ, বেরিয়ে আসা। কান্ট এখানে আলোকপ্রাপ্তির জন্মক্ষণেরও কথা বলছেন না। সূত্রপাতের কথা বলছেন না। আবার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার কথাও বলছেন না। কোনো ঐতিহাসিক পরিণামের কথা বলছেন না। বর্তমান যুগের স্বরূপ, তার বিশিষ্ট চরিত্রটি নিয়েই কেবল তিনি চিন্তিত। বর্তমান কোন্ অর্থে পৃথক, কোন্ অর্থে তা অতীতের তুলনায় একান্তভাবে

ভিন্ন, এটাই কান্টের প্রশ্ন। বর্তমানের ভিন্নতার মধ্যেই কান্ট 'এনলাইটেনমেন্ট', অথবা আরো ব্যাপক অর্থে আধুনিকতার সংজ্ঞা খুঁজেছেন।

কথাটায় একটা দাগ দিয়ে আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখছি ; পরে এই বর্তমানের ভিন্নতার প্রশ্নটিতে আমরা আবার ফিরে আসব। এখন চোখ ফেরানো যাক কান্টের প্রবন্ধের আর-একটি লক্ষণীয় প্রসঙ্গে। স্বনির্ভরতার প্রয়োজন না-হয় স্বীকৃত হল ; স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রধান শর্ত যে চিন্তা আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা মানে তো আর এই নয় যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কাজে, দৈনন্দিনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান, যে যেমন ইচ্ছে তাই করবে। তাহলে তো আর সমাজে নিয়মকানুন বলে কিছু থাকে না, পরিপূর্ণ নৈরাজ্যকেই কাম্য বলে মেনে নিতে হয়। 'আলোকপ্রাপ্তি'-র দার্শনিকেরা বলা বাহুল্য, মোটেই তা বলতে চাননি। ব্যক্তির স্বনির্ভরতা আর চিন্তার স্বাধীনতা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হয়েছে, ব্যক্তিজীবন আর সমাজজীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বা অবস্থায় স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকবে, আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বা অবস্থায় ব্যক্তিগত মতামত নির্বিশেষে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা নিয়ম মেনে চলতে হবে। 'আলোকপ্রাপ্তি' কাকে বলে ?' প্রবন্ধে কান্ট-ও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

তাঁর উত্তরের মূল পদ্ধতি হল, যুক্তি-ব্যবহারের দু-টি ক্ষেত্র পৃথক করে দেওয়া। একটিকে কান্ট বলছেন 'পাবলিক' যা সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয়, যুক্তি যেখানে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা বিশেষ কোনো সামাজিক অবস্থানকে পুষ্ট করে না। অন্যটি হল যুক্তির 'প্রাইভেট' ব্যবহার, যা ব্যক্তিগত এবং বিশেষ স্বার্থ বা অবস্থানকেই আশ্রয় করে। প্রথম ক্ষেত্রে চিন্তা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মোটেই কাম্য নয়। উদাহরণ দিতে গিয়ে কান্ট বলছেন, দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'পাবলিক' আলোচনার ক্ষেত্রে সে-বিষয়ে যাঁরা পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ, তাঁদের অবশ্যই, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু 'প্রাইভেট' ব্যক্তি হিসেবে আমি বলতে পারব না, আমি সরকারের রাজস্বনীতির সঙ্গে একমত নই অতএব আমি কর দেব না। সেনাবাহিনীর সংগঠন বা রণনীতি নিয়ে 'পাবলিক' আলোচনায় একজন সৈনিকও অংশ নিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার কাজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা নয়, আদেশ পালন করা। ধর্ম নিয়ে যেখানে 'পাবলিক' আলোচনা চলেছে, সেখানে ধর্মযাজক হয়েও আমি আমার নিজের ধর্মীয় সংগঠনের রীতিনীতি বা শাস্ত্রের সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যাজক হিসেবে আমার কাজ সংগঠনের স্বীকৃত মত প্রচার করা, স্বীকৃত রীতি পালন করা। 'প্রাইভেট' ক্ষেত্রে কোনো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

'পাবলিক' আর 'প্রাইভেট' ধারণাদুটির এ-ধরনের ব্যবহার পরবর্তীকালে বিশেষ প্রচলিত হয়নি। বরং সাধারণভাবে লিবেরাল সমাজদর্শনের চালু মত হল যে 'প্রাইভেট' বা

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই বিশ্বাস, মতামত, আচারব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিত। বরং 'পাবলিক' বা প্রকাশ্য সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেই স্বীকৃত নিয়মকানুন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কিন্তু পাবলিক/প্রাইভেট-এর ব্যবহার যেমনই হোক না কেন, কান্টের বক্তব্যটি বুঝে নেওয়া খুব একটা কঠিন নয়। ব্যক্তি হিসেবে যেখানে আমি কোনো বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন বা ব্যবস্থার অংশমাত্র, সমাজযন্ত্রের বিশেষ একটি যন্ত্রাংশ, সেখানে আমার কাজ স্বীকৃত নিয়ম মেনে চলা, স্বীকৃত অধিকারিকের নির্দেশ পালন করা। কিন্তু যুক্তিপ্রয়োগের অন্য একটি ক্ষেত্র আছে যা এই বিশেষ বা ব্যক্তিগত অবস্থানগুলি দিয়ে আবদ্ধ নয়, যা মুক্ত, সার্বজনীন। এটিই হল স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প চর্চা, এক কথায় 'আলোকপ্রাপ্তি'-র প্রকৃত স্থান।

লক্ষ করুন, স্বাধীন যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বা জ্ঞানের অনুসন্ধানের এই যে সাধারণ ক্ষেত্র, কান্ট যাকে বলছেন 'পাবলিক', সেখানে কিন্তু ব্যক্তিই কর্তা। প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তির শর্তই হল চিন্তার স্বাধীনতা। জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি যেখানে তার বিশেষ সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধারণ আলোচনার মঞ্চে অংশ নিচ্ছে, সেখানে তার চিন্তা এবং মত প্রকাশের অধিকার হতে হবে অবাধ। নিজের বিশ্বাস এবং মত নির্ধারণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, এবং সেই মতপ্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, হবে তার নিজের। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কান্ট এখানে বাকস্বাধীনতার অবাধ অধিকার দাবি করছেন তাদের হয়েই যারা যুক্তির ব্যবহার এবং জ্ঞানচর্চার আলোচনায় অংশ নেওয়ার যোগ্য, যারা এই অধিকার দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবে। কান্টের প্রবন্ধটি আলোচনা করতে গিয়ে ফুকো অবশ্য এই বিষয়টি তোলেননি। যদিও তুলতেই পারতেন, কারণ ফুকোর নিজের ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। সেটি হল, আধুনিক সমাজে শিক্ষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার নীতির পাশাপাশি বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব এবং আধিপত্য বিস্তার। আমরা একদিকে যেমন বলি, ধর্মীয় বা অন্য সামাজিক অনুশাসন কিংবা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার অধিকারে বঞ্চিত করা একান্তই অনুচিত, তেমনই আবার অন্যদিকে বলি, অমুক বিষয়ে অমুকের মতটাই গ্রহণীয় কারণ ঐ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। অর্থাৎ একদিকে যেমন আলোকপ্রাপ্তি বলতে আমরা স্বাধীন যুক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে অবাধ আলোচনার আদর্শ গড়ে তুলেছি। একই সঙ্গে অন্যদিকে তৈরি করেছি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত এক অধিকারভেদ। যার দরুণ কে কোন্ বিষয়ে কোন্‌খানে কতটা বলার অধিকারী তা নির্ণয় করার সুপরিচিত চিহ্ন হিসেবে ছড়িয়ে দিয়েছি পরীক্ষা, ডিগ্রি, উপাধি, তকমা। একবার শুধু ভেবে দেখুন, জন্ম থেকে, বস্তুত জন্মের আগে থেকে, মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরেও, আধুনিক মানুষকে তার প্রতিটি দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে কতরকমের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ শুনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া চলা আইনবিরুদ্ধ। আমার যদি ডাক্তারি ডিগ্রি বা লাইসেন্স না থাকে, আমি তো ওষুধের দোকানে গিয়ে

বলতে পারি না, জ্ঞানচর্চায় সকলের অবাধ অধিকার, প্রয়োজনীয় ডাক্তারি বই আমার পড়া আছে, আমায় অমুক ওষুধটা দিন। যেসব দেশে সার্বজনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে বিশেষজ্ঞের দ্বারা স্বীকৃত বিধিবদ্ধ স্কুলে লেখাপড়া করা বাধ্যতামূলক ; সেখানে আমি বলতে পারব না, আমার ছেলেমেয়েদের আমি বাড়িতে লেখাপড়া শেখাব। কে কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তার ভেদাভেদও স্পষ্ট। আজকের এই সভায় আমি ইতিহাস, সমাজদর্শন ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা করছি। আপনারা আগ্রহের বশে অথবা নিছকই ভদ্রতা করে এসে শুনছেন। আমি যদি আজ আয়োনোস্ফিয়ারে রশ্মিবিচ্ছুরণ কিংবা ডি. এন. এ. মলিকিউল নিয়ে বক্তৃতা করব বলে ঘোষণা করতাম, তাহলে নিশ্চয় আমাকে ফাঁকা ঘরে বক্তৃতা করতে হত এবং আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু দু-একজন হয়ত এতক্ষণে মানসিক রোগের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটতেন।

বলা বাহুল্য, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার রীতিনীতির সঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহারের প্রকরণগুলির সম্পর্ক নিয়ে আমরা সম্প্রতিকালে মিশেল ফুকোর লেখাপত্র থেকে অনেক কিছুই নতুন করে দেখতে শিখেছি। 'আলোকপ্রাপ্তি কাকে বলে ?' এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দু-শো বছর আগে কান্ট যা বলেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে তা আধুনিক সমাজদর্শনের অত্যন্ত মামুলি কথা বলে মনে হলেও, বাকস্বাধীনতা, চিন্তার মুক্তি, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত যুক্তিনির্ভর আলোচনার ক্ষেত্র, এই সবের পাশাপাশি এখন আমরা তার মধ্যে দেখতে পাব আলোচনায় অংশ নেওয়ার অধিকারভেদ, বিশেষজ্ঞের কর্তৃত্ব, জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ক্ষমতা ব্যবহারের প্রক্রিয়া। পশ্চিমের আলোকপ্রাপ্তির যুগের দার্শনিকদের লেখায় সার্বিক মুক্তিপ্রদায়ী এক আধুনিকতা নিয়ে যে সরল উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়, গত দু-শো বছরে পৃথিবীর ইতিহাসের নানা বীভৎসতার সাক্ষী আমাদের কাছে সে উচ্ছ্বাস— মহাজ্ঞানী কান্টের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেই বলছি— আদৌ প্রান্তবরস্ক মনে হয় না। আজ আধুনিকতার মাহাত্ম্য নিয়ে সংশয় বিশেষ চাপা নেই।

তিন

কিন্তু যে প্রশ্নটি উত্থাপন করে আলোচনা শুরু করেছিলাম, তার সদুত্তর কিন্তু এখনো আপনাদের দিতে পারিনি। গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে, অর্থাৎ আমাদের আধুনিক যুগের শুরু থেকে আধুনিকতার ধারক-বাহক-প্রবক্তারাই সেকালের তুলনায় একালে অবনতির চিহ্নগুলি নিয়ে এত সরব কেন ? রাজনারায়ণ বসু যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিকতা, নীতিবোধ, সব বিষয়েই উন্নতির চেয়ে অবনতি বেশি দেখেছিলেন, সেটা নিশ্চয় কোনো উত্তর-আধুনিক বিহ্বলতার বশবর্তী হয়ে দেখেননি। আমাদের আধুনিক হওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতরেই তাহলে এমন একটা কিছু কাজ করছিল যার দরুণ আধুনিকতাকে গ্রহণ করেও তার মূল্য অথবা ফলাফল সম্বন্ধে বরাবর আমাদের সংশয় থেকে গিয়েছে।

আমার বক্তব্য, উপনিবেশের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের আধুনিকতার ইতিহাস যেভাবে

আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, তাতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অবারিত মুক্তচিন্তার নন্দন-কাননের প্রতিশ্রুতি আমরা কখনোই সেভাবে বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রায় গোড়া থেকেই আমরা আঁচ করেছিলাম, জ্ঞানচর্চার সঙ্গে ক্ষমতা বিস্তারের যে আধুনিক প্রক্রিয়া, তাতে বিশ্বজনীন আধুনিকতার আমরা কেবল গ্রহীতাই হতে পারব। স্রষ্টা হওয়ার সুযোগ কেউ আমাদের দেবে না। তাই গত দেড়শো বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে এসেছি, বিশ্বজনীন আধুনিকতার মায়াজাল সরিয়ে সেই জায়গাটুকু খুঁজে বের করার যেখানে আমাদের আধুনিকতার আমরাই হব কর্তা।

ইতিহাস থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এদেশে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার প্রথম বিশ্বৎসভাগুলির একটি ছিল সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনেরাল নলেজ। প্রাক্তন ডিরোজিয়ানদের প্রতিষ্ঠা করা এই সমিতির বিষয়ে একটি ঘটনার কথা ইতিহাসের বইতে পাওয়া যায়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজের সভাকক্ষে সমিতির এক অধিবেশনে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা এবং পুলিশ'-এর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হচ্ছিল। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডি এল. রিচার্ডসন, যাঁর শেক্সপীয়র পড়ানো নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাগতস্বরে অভিযোগ করেন যে 'আলোকপ্রাপ্তির শহরে, সরকার নির্মিত সভাকক্ষে এই দেশ যাঁরা শাসন করছেন তাঁদের অত্যাচারী এবং লুণ্ঠনকারী বলে মুণ্ডপাত করার অর্থ রাজদ্রোহিতা। ...সরকার যদি ভারতবাসীর মানসিক উন্নতির বিষয়ে সচেষ্ট না হতেন এই কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হত না। এই কলেজকে তিনি রাজদ্রোহিতার আখড়ায় পরিণত হতে দিতে পারেন না। ভবিষ্যতে এই ধরনের সভা কলেজে অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।' সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, হিন্দু কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। তিনি রিচার্ডসনকে তিরস্কার করে বললেন, 'আপনার ব্যবহারে আপনি সভার অপমান করছেন। আপনি যদি আপনার মন্তব্য প্রত্যাহার না করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, আমরা এই ঘটনাটিকে হিন্দু কলেজের কমিটি, এমনকি প্রয়োজন হলে সরকারেরও নজরে আনতে বাধ্য হব। আমরা কলেজের কমিটির কাছে নিয়মমতো আবেদন করে অনুমতি নিয়ে এই পাবলিক সভাকক্ষে সভা করেছি, আপনার ব্যক্তিগত দয়ায় সভা করছি না। আপনি এই সভায় অতিথিমাত্র। সমিতির সভ্যকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার সময় আপনি কোনোমতেই বাধা দিতে পারেন না।'

ইতিহাসের বইতে এই ঘটনাটিকে সাধারণত শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উন্মেষের চিহ্ন হিসেবে দেখানো হয়। কথাটা যে ভুল, তা নয়। কিন্তু নেটিভ ছাত্র তার সাহেব মাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে, এই সহজ নাটকীয়তার চাইতেও এখানে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হল যে পাবলিক আলোচনার ক্ষেত্রে অবাধ বাকস্বাধীনতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তারাচাঁদ চক্রবর্তী বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ কোনো বিশ্বৎসমাজের সভ্যের মতামত প্রকাশের অধিকার, সে মত যতই সরকার-বিরোধী হোক না কেন, তা খর্ব করা

যায় না। বলা যেতে পারে, আলোকপ্রাপ্তির শর্তগুলোকে আপন করে নেওয়ার এ হল আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা। আধুনিকতার সেই প্রথম লগ্নে আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জাতি-বর্ণের কোনো ভেদ নেই, আলোচ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তির প্রমাণ দিতে পারলে সেখানে মত-প্রকাশের অবাধ অধিকার।

মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেই দেখা গেল, বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান খোলা হতে শুরু করেছে। প্রথম যুগের বিশ্বৎসভাগুলি— এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আরম্ভ করে সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনেরাল নলেজ, বেটন সোসাইটি কিংবা বেঙ্গল সোসাইটি কিংবা বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন— তাদের সভ্যরা ছিল ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় মেশানো। এবার গড়ে উঠতে লাগল একান্তভাবে ভারতীয় বিদ্যোৎসাহীদের প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য ভারতীয়দের জন্য, সম্ভব হলে ভারতীয় ভাষায়, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রসার। উনিশ শতকে স্থাপিত এ-ধরনের জাতীয় বিশ্বৎসভার অনেকগুলিই সুপরিচিত— যেমন তত্ত্ববোধিনী সভা কিংবা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স কিংবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক জ্ঞানচর্চার জাতীয়করণ; আধুনিক ভাবনাচিন্তার বিশ্বজনীন ক্ষেত্র থেকে কিছুটা সরে এসে এমন একটা জায়গা তৈরি করা যেখানে বিদ্যাচর্চা হবে আধুনিক, অথচ জাতীয়।

এ-প্রচেষ্টা এখনো চলেছে। তার সাফল্য এক-এক বিষয়ে এক-এক রকম। কিন্তু প্রচেষ্টাটি আদৌ সম্ভব বলে মনে হয়েছিল কেন এবং তার সাফল্যের সম্ভাবনাগুলো কোন্ কোন্ শর্তের ওপর নির্ভরশীল, তা বলতে না পারলে আমাদের আধুনিকতা নিয়ে যে-প্রশ্নটা আমি গোড়াতে তুলেছিলাম, তার উত্তর দেওয়া যাবে না। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে চর্চায় আমাদের গত দেড়শো বছরের যা অভিজ্ঞতা, তার যে-কোনো একটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে এ-আলোচনা করা যেতে পারে। যেহেতু শরীর-স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ ধরেই কথাটা তুলেছিলাম, তাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের গল্পটাই একবার শোনা যাক।

১৮৫১ সালে কলকাতার মেডিকাল কলেজে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা পড়াবার জন্য একটি বাঙলা বিভাগ খোলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজি শিখে আসেনি, এমন ছাত্রদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। মনে রাখা দরকার, তখনও উচ্চবর্ণ-সমাজে শবব্যবচ্ছেদ, মলমূত্র পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে সংস্কার যথেষ্ট দৃঢ়, তাই পেশা হিসেবে ডাক্তারি তখনো পর্যন্ত ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে খুব একটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। মেডিকাল কলেজের বাঙলা বিভাগের লাইসেন্সিয়েট এবং অ্যাপথিকারি পাঠক্রম কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ১৮৫১-র প্রথম বছরে এই বিভাগে মাত্র বাইশ জন ছাত্র ছিল। ১৮৬৪ সালে এর ছাত্রসংখ্যা ইংরেজি বিভাগকে ছাড়িয়ে

যায়। ১৮৭৩ সালে বাঙলা বিভাগে ৭৭২ জন ছাত্র ছিল, ইংরেজি বিভাগে ৪৪৫। কেবল ছাত্রদের প্রয়োজনেই ১৮৬৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বাঙলা ভাষায় প্রায় সাতশো চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হয়।

পাঠক্রমের জনপ্রিয়তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না। ধরেই নেওয়া যেতে পারে সমাজের প্রয়োজনে এবং জীবিকায় উপকরণ হিসেবে বাঙলা লাইসেন্সিয়েট ডিগ্রির চাহিদা ছিল। কিন্তু ১৮৭০ থেকেই ভারতীয় ভাষায় ডাক্তারি ছাত্রদের যোগ্যতা নিয়ে অভিযোগ উঠতে লাগল। ইংরেজি জানে না বলে তারা নাকি সরকারি হাসপাতালে ইয়োরোপীয় ডাক্তারদের সহকারী হিসেবে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। তারা প্রেসক্রিপশন পড়তে পারে না। প্রয়োজনীয় রিপোর্ট লিখতে পারে না। মনে রাখতে হবে, এই সময় থেকেই বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সরকারি হাসপাতাল তৈরি হতে শুরু করেছে। লন্ডনের জেনেরাল মেডিকাল কাউন্সিল থেকে চিকিৎসকদের যোগ্যতা এবং পেশাদারি আচার-আচরণের ওপরেও নজর রাখা শুরু হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে হাসপাতাল ব্যবস্থা, মেডিকাল কাউন্সিল এবং পেটেন্ট-করা ওষুধপত্রের ব্যবহার যখন প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে গেল, মেডিকাল স্কুলের বাংলা বিভাগেরও নাভিশ্বাস উঠল। ১৯১৬ থেকে আমাদের দেশে কেবলমাত্র ইংরেজিতেই ডাক্তারি পড়া যায়।

গল্পের কিন্তু এখানে শেষ নয়। যে-সময় ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, ঠিক সেই সময় আবার আয়ুর্বেদ আর ইয়ুনানী চিকিৎসাকে আধুনিক বিদ্যাচর্চার আকারে ঢেলে সাজাবারও চেষ্টা চলেছে। নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলন, যা এখনো আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, তৈরি হয় ১৯০৭ সালে। আয়ুর্বেদ আর ইয়ুনানী নিয়ে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল নানা রকমের প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালীগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সুসংহত চেহারা দেওয়া, প্রাচীন এবং সাম্প্রতিক পুঁথির সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করা, প্রথাগত পারিবারিক বা গুরু-শিষ্য পরম্পরার বদলে আধুনিক স্কুল-কলেজ পদ্ধতিতে সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা এবং ডিগ্রির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। এবং আধুনিক শিল্পপদ্ধতিতে আয়ুর্বেদ এবং ইয়ুনানী ওষুধের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পাশ্চাত্য প্রণালীর সাহায্য নেওয়া উচিত কিনা, তাই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন এবং সুবিধা অনুযায়ী সে-সাহায্য নেওয়া উচিত, এটাই মোটামুটিভাবে এখনকার স্বীকৃত মত।

অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিশ্বজনীন একটা ক্ষেত্র আছে, তা এখানে স্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু দেশজ আয়ুর্বেদচর্চার একটা স্বতন্ত্র ধারা, স্বতন্ত্র প্রণালী আছে, তাও বলা হচ্ছে। সেই স্বতন্ত্র প্রণালীর আবার আধুনিকীকরণ করে পশ্চিমী বিজ্ঞানচর্চার রীতিনীতি অনুযায়ী ঢেলে সাজানোও হচ্ছে। এখানে কথাটা কিন্তু এই নয় যে আয়ুর্বেদ বা ইয়ুনানী চিকিৎসাপ্রণালীর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আধুনিক যুক্তিনির্ভর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য। তা যদি হত তাহলে তো সেইসব প্রণালী পাশ্চাত্য

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে প্রয়োজনমতো অন্তর্ভুক্ত করে নিলেই চলত। কথাটা এমনও নয় যে কিছু কিছু অসুখ আছে যা ভারতবর্ষেই বেশি হয়, সেইসব অসুখের পক্ষে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাই উপযুক্ত। আধুনিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসার লক্ষ্য এবং বিষয় কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার তুলনায় আলাদা কিছু নয়। কিন্তু দাবি হল যে তা একটি স্বতন্ত্র এবং বিকল্প চিকিৎসাবিজ্ঞান।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরকম স্বতন্ত্র এবং বিকল্প আধুনিকতার অনেক প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি। বলা যেতে পারে, জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক প্রকল্পটাই তাই— একটি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র জাতীয় আধুনিকতার জন্ম দেওয়া। কোন্ কোন্ উপাদানে আধুনিকতা থাকবে আর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নই বা কী হবে, বলা বাহুল্য, তার কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এখনো হয়ে চলেছে। আমার বক্তব্য ছিল, এ-প্রচেষ্টা শুধু তথাকথিত সংস্কৃতিনির্ভর শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম ইত্যাদি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানচর্চার মতো আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন কাজেও এই স্বতন্ত্র আধুনিকতা খোঁজা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো বিজ্ঞানীও 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' লেখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর জীবনের শেষ দিকে যে-গবেষণায় হাত দিয়েছিলেন, তার উৎস ভারতীয় দর্শন এবং জীবনধারায় নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। বিশেষ করে ভারতীয় বিজ্ঞানীই এমন গবেষণা করতে পারেন, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জগদীশচন্দ্রের সে-গবেষণা পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু এমন প্রচেষ্টার কথা তাঁর আদৌ মনে হয়েছিল কেন, এই প্রশ্নটা করলে আমাদের আধুনিকতার মূল চালিকাশক্তির হদিশ পাওয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা।

চার

আলোকপ্রাপ্তির কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে যায় কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের সেই অবিস্মরণীয় প্রথম ক-টি লাইন। 'আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।'

আধুনিকতাই প্রথম সমাজদর্শন যা নিতান্ত সাধারণ মানুষের চেতনাতেও স্বাতন্ত্র্য আর কর্তৃত্বের স্বপ্নজাল সৃষ্টি করে। আধুনিক সমাজে ক্ষমতাপ্রয়োগের প্রক্রিয়াই এমন যে তা কোনো সার্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা না হয়ে প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব যুক্তিপ্রসূত অনুশাসন হিসেবেই কাজ করতে চায়। কিন্তু যুক্তির বুনুনি যতই ক্ষমতার বাস্তবতাকে আড়াল করার চেষ্টা করুক, স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ইচ্ছা প্রতিনিয়তই ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করায়, তাকে প্রতিরোধ করে। মনে করে দেখুন, একসময় আধুনিকতাই ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতার সমর্থনে সবচেয়ে বড় যুক্তি ; ভারতবাসী আলোকপ্রাপ্ত হবে, তাই

নাকি বিদেশী শাসন প্রয়োজন। আবার ঐ আধুনিকতার যুক্তিতেই একদিন আমরা শিখলাম, সাম্রাজ্যবাদের শাসন অন্যায়। স্বাধীনতাই কাম্য। যুক্তির বোঝা, মুক্তির স্বপ্ন; ক্ষমতার স্পৃহা, ক্ষমতার প্রতিরোধ; এ-সবই আধুনিকতার অঙ্গ। ক্ষমতার তন্ত্রজালের বাইরে আধুনিকতার কোনো স্বর্গরাজ্য নেই। তাই এই অর্থে আধুনিকতার পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া যায় না। কেবল আধুনিকতাকে ব্যবহার করার নানা ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করা যায়। সে-কৌশল কখনো হিতকর, কখনো বিধ্বংসী, কখনো সহিষ্ণু, কখনো বা হিংস্র। আধুনিক এবং যুক্তিসিদ্ধ বলেই যে তা মঙ্গলময়, এমন সরল বিশ্বাস, আগেই বলেছি, আমরা বহুদিন হল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

কমলকুমারের উপন্যাসে দেখেছি, নিয়তির অনিবার্য নিয়মে কোটাল বান এসে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় জড়বৎ হিন্দু সমাজ। সঙ্গে দোসর নিয়ে যায় যা সজীব, সুন্দর, স্নেহশীলা, দয়াময়ী। প্রাকৃতজন চণ্ডাল তাকে বাঁচাতে পারে না; যা শুচি, পবিত্র, তাকে স্পর্শ করার অধিকারে সে বঞ্চিত। 'একটি মাত্র চোখ, হেমলকে প্রতিবিম্বিত চক্ষুসদৃশ, তাঁহার দিকেই, মিলন অভিলাষিণী নববধূর দিকে চাহিয়াছিল, যে চক্ষু কাষ্ঠের, কারণ নৌকাগাত্রে অঙ্কিত, তাহা সিন্দুর অঙ্কিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।'

আমাদের আধুনিকতার চালিকাশক্তি এই মায়া। একে পশ্চাৎমুখী পরিবর্তনবিমুখ বলে ভাবলে নিজেদের প্রতি অবিচার করা হবে। বরং বর্তমান যে পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে, তাকে পরিবর্তন করা যে আমাদের কর্তব্য, এই ইচ্ছার জন্ম দেয় হৃত অতীতের প্রতি মায়া। মনে রাখতে হবে, বিশ্বজনীন আধুনিকতার প্রাঙ্গণে আমরা ব্রাত্য, চণ্ডাল। আমাদের কাছে সে-আধুনিকতার মানে বিদেশী জিনিসের ফ্যান্সি মার্কেট। থরে থরে সাজানো রয়েছে পয়সা ফেল, কিনে নিয়ে যাও। আধুনিকতার উৎপাদক হিসাবে সেখানে কেউ আমাদের পোঁছে না। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভাবলে যা নিদারুণ ভাবে সত্য, তা হল আমাদের অধীনতা, আমাদের নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু আমরা আধুনিক হতে চাই বলেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার ইচ্ছা, সৃজনশীল হওয়ার ইচ্ছা প্রক্ষিপ্ত হয়ে যায় অতীতে। এ-অতীতকে কাল্পনিক বলাটা বাহুল্য, কারণ অতীত সবসময়ই কাল্পনিক। একালের অসন্তোষ, অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তির উল্টো প্রান্তে আমরা নির্মাণ করে নিই এমন এক সেকাল যা সুন্দর, কল্যাণময়, সুস্থ সামাজিকতার আবাসভূমি, এবং যা ছিল আমাদেরই সৃষ্টি, যেখানে আমরাই ছিলাম কর্তা। আমাদের এই সেকাল আদৌ কোনো ঐতিহাসিক অতীত নয়, বর্তমানের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কেবল এর নির্মাণ। শুধু লক্ষণীয়, পাশ্চাত্য আধুনিকতার আদিকল্পে কান্ট যেখানে অতীতের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলেছেন, সে জায়গায় আমাদের কাছে বর্তমানের লক্ষণগুলোই হয়ে গেছে নেতিবাচক, নঞর্থক। এই আধুনিকতার গতিপ্রকৃতি, তার চালিকাশক্তি, পশ্চিমের আধুনিকতার ইতিহাসের তুলনায় একান্তভাবে ভিন্ন।

এ হল আমাদের, একদা-পরাধীনের আধুনিকতা। যে প্রক্রিয়ায় আমরা আধুনিক হয়েছি,

সেই একই প্রক্রিয়ায় আমরা আধুনিকতার শিকারও হয়েছি। আধুনিকতার প্রতি আমাদের মনোভাব তাই গভীরভাবে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক না হয়ে পারে না। রাজনারায়ণ বসুর সময় থেকে গত দেড়শো বছরের অভিজ্ঞতা আমরা যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি, এবং আজও করি, তাতে এ-কথা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব আধুনিকতার পক্ষে বা বিপক্ষে থাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে আসছে না। দ্বিধা এইজন্য যে নিজেদের বিশিষ্ট আধুনিকতার রূপগুলি উদ্ভাবন করতে গেলে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতাকে সময় সময় বর্জন করার সাহস দেখাতে হয়। জাতীয়তাবাদের যুগে এ-ধরনের বহু প্রচেষ্টা হয়েছিল। সে-প্রচেষ্টার পেছনে সাহস ছিল, উদ্ভাবনী শক্তি ছিল, সাফল্য সবক্ষেত্রে সমান ছিল না। আজ গ্লোবালাইজেশনের যুগে হয়ত নতুন করে সাহস দেখাবার সময় এসেছে। তাই 'আমাদের আধুনিকতা'-র সেকাল আর একাল নিয়েও বোধহয় এবার আমাদের ভাবনা শুরু করা উচিত। □